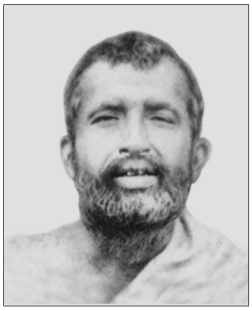

কথালাপে নবযুগের শাস্ত্রসংরচন

সুব্রতা সেন

স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের আরম্ভ হয়েছিল। এযুগে চাই নতুন বেদ, নতুন স্মৃতি। ভারতীয় দৃষ্টিতে বেদ হল চিরন্তনী প্রজ্ঞাবাণী। এই অপৌরুষেয় নিত্য শব্দ রাশি ঋষিদের তপস্যাপূত হৃদয়ে উদ্ভাসিত, শ্রবণে মন্দ্রিত ও শ্রীমুখে উচ্চারিত। পুত্র-শিষ্য পরম্পরাক্রমে শ্রুত ও প্রচারিত বলে এর অপর নাম শ্রুতি। কালবশে ভুলে যাওয়া বেদার্থ যে ঋষিরা স্মরণ করে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁরাই স্মৃতিকার। স্বামীজী নিজে এই নবযুগের উপযোগী স্মৃতি রচনা করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কথালাপে বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের স্বত উৎসারিত প্রজ্ঞাবাণী মানুষের স্মরণপথে চিরজাগরূক থেকে যাতে যুগ যুগ ধরে মানবজীবনকে আলোকিত করে রাখে সেই উদ্দেশ্যেই স্বামীজীর স্মৃতিরচনার পরিকল্পনা।

শাস্ত্র শব্দ সংস্কৃত শাস্ ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর তাৎপর্য হল, শাস্ত্র প্রভুর মতো শাসন করে মানুষকে কর্তব্যপথে চালিত করে। নিখিলশাস্ত্রমূর্তি হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ আজীবন জগদম্বার বালক। গুরু, বাবা, কর্তা সম্বোধনে তাঁর গায়ে কাঁটা বেঁধে। তাঁর জীবনের কোনও কাজই পরিকল্পনা করে নয়। জগদম্বার ইচ্ছায় পরিচালিত এই দিব্যবালকের স্বচ্ছন্দ চরণপাতে ফুটে উঠেছে অজস্র কল্যাণকমল, সহজপ্রজ্ঞার আলোকে ভাস্বর হয়েছে অখিলমানবের অজ্ঞান অন্ধকার, তাঁর কথামৃতের আস্বাদনে মানুষ পেয়েছে মহা মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্র। কাজেই এখানে 'শাস্ত্রসংরচন' শব্দের অর্থ শাস্ত্ররচনা নয়, সর্ব শাস্ত্রের মর্মার্থের উদ্ভাস।

বর্তমান প্রবন্ধে কথামৃতের উদ্ধৃতি সহায়ে দেখানো হয়েছে কীভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথালাপে সনাতন শাস্ত্রেরই যুগোপযোগী প্রকাশ ঘটেছে, কীভাবে তাঁর প্রতিটি সুচিন্তিত মন্তব্য বেদবাণীর মতো অমোঘ, মনুষ্যজীবনে নিত্য অনুসরণীয় হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে (মুখ্যত স্মৃতি ও পুরাণে) পর্যায়ক্রমে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারটি যুগের আগমনের কথা বলা হয়েছে। পরাশরস্মৃতি অনুসারে এক একটি কল্প অর্থাৎ এক একটি যুগের অবস্থিতিকাল শেষ হলে কল্পান্তরে প্রতি নতুন যুগের প্রারম্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যথাক্রমে শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার নির্ণয় করে থাকেন।

শ্রুতি অপৌরুষেয় বলে ব্রহ্মা পূর্বকল্পের শ্রুতি স্মরণ করেন। স্মৃতিকার মনুও শ্রুতিবাক্য স্মরণ করেই ওই নির্ণীত কর্তব্যের নির্দেশ দেন (মনুসংহিতা, আচার অধ্যায়, ২০, ২১)।

কল্পে কল্পে নতুন সৃষ্টির কথা শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর নিজস্ব মধুর ভাষায় কেশবচন্দ্র সেনকে বলেছেন : ''যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে।... আদ্যাশক্তি... জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন।... মাকড়সা আর তার জাল।... ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।''

পুরাণমতে ভগবান বিষ্ণু ত্রেতাযুগে রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হলেন। দ্বাপরের শেষে এলেন শ্রীকৃষ্ণরূপে। বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণ যতদিন শরীরে ছিলেন কলি আসতে পারেনি, তাঁর দেহত্যাগের পর কলি পৃথিবীতে তার আধিপত্য বিস্তার করেছে (''যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।/ প্রতিপন্নং কলিযুগং প্রমাণং তস্য মে শৃণু॥'' (মৎস্যপুরাণ, ২৭৩। ৪৮-৪৯) শাস্ত্রদৃষ্টিতে কলিকাল চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অধঃপতনের কাল—এককথায় মহা অনর্থের যুগ। এযুগ যতই ভয়ংকর হোক না কেন, কালচক্রের আবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে কলির সমাপ্তিতে সত্যযুগ আসবেই। কলির শেষে ধর্মপরায়ণ মানুষের জন্ম হবে যাঁদের তপস্যা সত্যযুগের আগমন ত্বরান্বিত করবে।

সন্দিগ্ধচিত্ত প্রশ্ন করেন—ঠাকুরের আবির্ভাবের একশো পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হতে চলেছে, পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন তো হল না! নীতিহীন কলির ভয়াবহ দৌরাত্ম্যে আতঙ্কিত ও বিপর্যস্ত সমাজমানস দিনে দিনেই যেন করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। মহাকালের প্রেক্ষিতে একশো পঁচাত্তর বছর আর কতটুকু? তবু ঠাকুরের কথাতেই এর জবাব আছে। পণ্ডিত শশধরকে দেখে ঠাকুর আনন্দে বলছেন, ''আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম... কেন বললুম জান? সীতা রাবণকে বলেছিলেন, রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ।... উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হয়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে!'' সুতরাং চারপাশের বিশৃঙ্খলা ও অন্যায়ের প্রাদুর্ভাব দেখে বিচলিত হবার কিছু নেই। শ্রীরামকৃষ্ণকে ধারণ করে সত্যযুগ এসেছে নিশ্চিত প্রত্যয়ে নিঃশব্দ চরণে। মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন অধিকাংশ মানুষ এখনও টের পায়নি নতুন সূর্যের অরুণকিরণ তাদের রুদ্ধ নয়ন স্পর্শ করে জাগিয়ে দিতে এসেছে। 'সকলের রেণুর রেণু, দাসের দাস' বলে যিনি জনসংসদে আত্মগোপন করেছেন সর্বদা, তিনি কিন্তু একবারও দাবি করেননি যে তাঁর আগমনে সত্যযুগের আবির্ভাব হয়েছে, সমকালকে বোঝাতে বরং প্রতিশব্দ হিসেবে ঠাকুর ব্যবহার করেছেন 'কলিকাল'।

সত্যযুগ পূর্ণমহিমায় ভাস্বর হলে কেমন হবে জগতের চেহারা? কল্কিপুরাণ বলছেন—''সর্বশস্যা বসুমতী হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতা।/ শাঠ্যচৌর্যানৃতৈর্হীনা আধিব্যাধিবিবর্জিতা॥'' অর্থাৎ পৃথিবী সকল শস্যে পূর্ণ হবে, মানুষ থাকবে আনন্দিত, শরীরে-মনে সম্পূর্ণ নীরোগ। সমাজে থাকবে না কোনও শঠতা, চৌর্য ও মিথ্যাচার। সকলের জন্য সনাতন ভারতবর্ষের এই অভীপ্সাই তো আমরা নিত্যকার প্রার্থনামন্ত্ররূপে উচ্চারণ করে থাকি : ''সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।/ সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥'' আবার আমরা যে প্রার্থনা করি : ''দুর্জনঃ সজ্জনো ভূয়াৎ, সজ্জনঃ শান্তিমাপ্নুয়াৎ'' তা পূর্ণ হলেই তো সমাজে শঠতা, চুরি ও মিথ্যাচারের অবসান হয়। মানুষও দেহমনে সুস্থ, শুদ্ধ হয়ে শান্তিলাভ করবে। সত্যযুগের মূলকথা হল সত্যাশ্রয়। সত্যনিষ্ঠাই মানুষকে পৌঁছে দেবে শান্তির নিলয়ে। ভাগবতে বলা হল—''সত্যধর্মরতো নিত্যং তীর্থানাঞ্চ সদাশ্রয়ম্।/ নন্দন্তি দেবতাঃ সর্বাঃ সত্যে সত্যপরা নরাঃ॥''—সত্যযুগের মানুষ সত্যাশ্রয়ী, সত্যধর্মরত হবে।

এযুগের ভগবান তাই নতুন শাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করলেন সত্যের ওপর। সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে ১৮৮৩, ২৬ নভেম্বর ব্রাহ্মভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''সত্যকথাই কলির (ইদানীংকালের) তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়।'' তিনি নিজে জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি, ভালো-মন্দ, পুণ্য-পাপ—সবই জগন্মাতাকে নিবেদন করে শুদ্ধাভক্তি চেয়েছিলেন কিন্তু মাকে সত্য দিতে পারেননি। এর কারণ হিসেবে পার্ষদদের জানিয়েছেন,

''ঐরূপে সত্য ত্যাগ করিলে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সর্বস্ব যে অর্পণ করিলাম—এ সত্য রাখিব কিরূপে?''। দক্ষিণেশ্বরে কথাপ্রসঙ্গে (১৮৮৩, ১লা জানুয়ারি) প্রাণকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—''যারা বিষয়কর্ম করে—আফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যতে থাকা উচিত। সত্যকথা কলির তপস্যা।''

সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারবরিষ্ঠ হয়েও সুতীব্র সাধনায় সকল মত ও পথ অনুসরণ করে এই পরম উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন—'সত্যলাভের অনন্ত মত, অনন্ত পথ'। সেই পরমতত্ত্বকে নানা সম্প্রদায় নানা নামে ডাকে। অশ্বিনীকুমার দত্তকে ঠাকুর বোঝালেন তাঁর অনবদ্য ভাষায় : ''সেই একই জিনিস, নানা লোকে নানা নাম করে। যেমন পুকুরের চারপাশে চারঘাট। এ ঘাটের লোক জল নিচ্ছে; জিজ্ঞাসা কর, বলবে 'জল'। ও ঘাটে যারা জল নিচ্ছে, বলবে পানি। আর একঘাটে ওয়াটার, আর একঘাটে এ্যাকোয়া। জল তো একই।''

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে সম্বোধন করে বলছেন, ''হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাহিছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপই ব্যবস্থা করেছেন।''

নিজেদের অধিকার ও রুচি অনুযায়ী মানুষ ঈশ্বরচিন্তা করবে, পরের অধিকার ও রুচিকে সম্মান দেবে—এটিই যুগাবতারের নতুন শাস্ত্র। অথচ তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা হল—''যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব—সব পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে যাকে কৃষ্ণ বলছো, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম, তাঁর হাজার নাম।'' ১৮৮৩-র ১১ মার্চ দক্ষিণেশ্বরে জনৈক গোস্বামীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝাচ্ছেন, ''ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।'' ''সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর।... ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ।... কোনও কোনও ভক্তের কাছে তিনি নিত্য সাকার। এমন জায়গা আছে যেখানে বরফ গলে না।'' কাজেই 'মতুয়ার বুদ্ধি' অর্থাৎ 'আমার ধর্মই ঠিক আর সকলের মিথ্যা'—এ বুদ্ধি খারাপ। বলরাম মন্দিরে বলরামের পিতাকে লক্ষ করে সমন্বয়ী দৃষ্টির প্রশংসা করছেন—''যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে! আমি কিন্তু দেখি—সব এক।... বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণে তাঁরই কথা—সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।'' আর একদিন লীলা ও নিত্যপ্রসঙ্গে মাস্টারমশাইকে বলছেন, ''লীলা ধরে ধরে নিত্যে যেতে হয়; যেমন সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠা। নিত্যদর্শনের পর নিত্য থেকে লীলায় এসে থাকতে হয়, ভক্তি ভক্ত নিয়ে। এইটি পাকা মত।'' ১৮৮৩-র ১৬ অক্টোবর দক্ষিণেশ্বরে নিজের নিত্যলীলা যোগের বর্ণনা দিচ্ছেন, ''কে জানে বাপু, আমার এই একরকম অবস্থা। আমি কেবল নিত্য থেকে লীলায় নেমে আসি, আবার লীলা থেকে নিত্যে যাই।'' লীলায় নেমে দেখেন সেই নিত্যই 'ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ হয়ে রয়েছেন।' আবার কখনও তিনি দেখান, তিনিই এইসব জীবজগৎ করেছেন—যেমন বাবু ও তার বাগান। ''তিনি কর্তা আর তাঁরই এই সমস্ত জীবজগৎ—এইটির নাম জ্ঞান।'' নিত্যের লীলা চাররকম—ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, জগৎলীলা, নরলীলা। বেদান্তের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' তত্ত্ব তাঁর নিত্য-লীলার মেলবন্ধনে নতুন রূপ লাভ করল। তিনি দেখলেন, ''যতক্ষণ ভক্তের আমি আছে ততক্ষণ লীলাও সত্য। আমি যখন তিনি পুছে ফেলবেন, তখন যা আছে তাই আছে।'' ''আমি বোধ যায় না। যতক্ষণ আমি বোধ থাকে ততক্ষণ জীবজগৎ মিথ্যা বলবার জো নাই! বেলের খোলটা আর বিচিগুলো ফেলে দিলে সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া যায় না।'' বললেন—যেহেতু মানুষের আমিবোধ যায় না, সুতরাং কাঁচা আমি ত্যাগ করে দাস, সন্তান বা

ভক্তরূপে দ্বৈতভাবে সাধনা করাই শ্রেয়। এইভাবে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের বিরোধ মিটে গিয়ে সকল মতবাদ পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়াল।

এযুগের শাস্ত্রে মানুষ অসাধারণ মর্যাদায় মণ্ডিত। ঈশ্বরের নরলীলার মহিমা বর্ণনা করে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ভক্তদের বলছেন : ''মানুষ কি কম গা? ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করতে পারে, অন্য জীবজন্তু পারে না। অন্য জীবজন্তুর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে আবার সর্বভূতে তিনি আছেন; কিন্তু মানুষে বেশি প্রকাশ।'' মানুষের এই চিন্তাশক্তি ও অনুভবসামর্থ্যের জন্য ভগবানও মানুষরূপে 'অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য।' ''তাঁকে নররূপে দেখতে পেলে তবে তো ভক্তেরা ভালোবাসতে পারবে, তবেই ভাই-ভগিনী, বাপ-মা, সন্তানের মত স্নেহ করতে পারবে। তিনি ভক্তের ভালোবাসার জন্য ছোটটি হয়ে লীলা করতে আসেন।'' ১৮৮৪-র ২৪ মে দক্ষিণেশ্বরে শিবমন্দিরের সিঁড়িতে বসে ভক্তদের কাছে ঠাকুর তাঁর তৎকালীন ভাব ব্যক্ত করলেন : ''ভক্ত তোমরা, তোমাদের বলতে কি? আজকাল ঈশ্বরের চিন্ময় রূপ দর্শন হয় না। এখন সাকার নররূপ এইটে বলে দিচ্ছে। আমার স্বভাব ঈশ্বরের রূপ দর্শন-স্পর্শন-আলিঙ্গন করা। এখন বলে দিচ্ছে, তুমি দেহধারণ করেছ, নররূপ লয়ে আনন্দ কর।'' আর একদিন 'দেবী চৌধুরানী' পাঠ শুনতে শুনতে ঠাকুরের কথায় বিষয়টি ভক্তদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল : ''তিনি মানুষ হয়েও লীলা করছেন। আমি দেখি সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাঠ ঘষতে ঘষতে যেমন আগুন বেরোয় ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বরদর্শন হয়।'' জোর দিয়ে বলছেন, ''প্রতিমায় পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না?'' এজন্যই নবযুগের শাস্ত্র অনুযায়ী জীবে দয়া করা চলে না, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথ শাস্ত্রীকে উপলক্ষ্য করে জগৎলীলা সম্পর্কে ঠাকুর নিজের অনুভব প্রকাশ করলেন—''আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান কত্তুম। তারপর ভাবলুম, এমন কল্লে (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন আর এমন কল্লে (চক্ষু খুললে) কি ঈশ্বর নাই? চক্ষু খুলেও দেখছি, ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, চন্দ্র-সূর্যমধ্যে, জলে স্থলে সর্বভূতে তিনি আছেন।'' অন্যত্র গোপীদের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে বলছেন—''প্রেমোন্মাদ হলে সর্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্বভূতে (নিজেদের মধ্যেও) শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল, আমি কৃষ্ণ।''

এই জগৎলীলানিকেতনই নরলীলার ও নররূপী ঈশ্বরলীলার অধিষ্ঠান। যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়—এই যদি আসল কথা তাহলে কী বা ঐহিক, কী-ই বা আধ্যাত্মিক! ঐহিক বলে সত্যি কি কিছু আছে? নানা মতে পথে সাধনসিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন আধ্যাত্মিক জগতে অনন্ত মত ও অনন্ত পথের সামঞ্জস্য বিধান করে বিশ্বে ধর্মদ্বন্দ্বের চিরকালীন সমাধান দিয়েছেন তেমনই নরলীলা ও জগৎলীলার পরিচয় দিয়ে ঐহিক ও পারমার্থিক জীবনের সার্থক সমন্বয় ঘটিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে জগৎলীলার মঞ্চে নরলীলার যাবতীয় চিন্তা, বাক্য ও কর্মপ্রয়াস—বিদ্যার্জন, জীবিকার্জন, পরিবার প্রতিপালন, সাধনভজন—সবই তো নররূপী নারায়ণের বিবিধ ভূমিকায় লীলা-অভিনয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, জটিলে-কুটিলে দিয়ে এ লীলা পোষ্টাই হয়। কাঁচা আমির প্রভাবে মানুষ নিজেদের অভিনয়কেই সত্যি বলে ভাবছে, দর্শক হয়ে লীলার রস আস্বাদন করতে পারছে না। এযুগের প্রেমস্বরূপ ভগবান তাই মানুষকে আপন লীলারস আস্বাদনের কৌশল শেখালেন। শ্যামপুকুরবাটীতে ড. মহেন্দ্রলাল সরকারকে উপলক্ষ্য করে 'কাঁচা আমি' আর 'পাকা আমি'র পার্থক্য ও প্রভাব বোঝাচ্ছেন ঠাকুর—''কাঁচা আমি কি জান? আমি কর্তা, আমি এত বড়োলোকের ছেলে, বিদ্বান, আমি ধনবান আমাকে এমন কথা বলে! এইসব ভাব!'' কাঁচা আমি অর্থাৎ অহংকার পাকাপোক্ত হলে বুড়োর আমি হয়। ''বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, বিষয়বুদ্ধি, পাটোয়ারি, কপটতা।'' এই জগতকে ঈশ্বরলীলা না ভেবে অজ্ঞানবশত জগদ্রূপে সত্য ভাবলে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি হয় এবং তার থেকে ''বিদ্যার অহংকার, টাকার অহংকার,

উচ্চপদের অহংকার—এইসব হয়।" এ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি। এ অশান্তি কী করে যাবে? নন্দ বসুর বাড়িতে বিবেকাত্মক বিচারের পদ্ধতি শেখাচ্ছেন ঠাকুর : ''আমি কি এটা খোঁজো দেখি। আমি কি হাড়, না মাংস, না রক্ত না নাড়িভুঁড়ি? আমি খুঁজতে খুঁজতে তুমি এসে পড়ে অর্থাৎ অন্তরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই। আমি নাই! তিনি। আমি বোধ একেবারে যায় না বলে 'পাকা আমি' নিয়ে থাকতে হয়।"

আমি ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস—এই আমি পাকা আমি। সত্যদর্শনের পক্ষে কামিনী-কাঞ্চনই প্রধান বাধা। কামিনী-কাঞ্চন বলতে ঠাকুর প্রধানত নরনারীর পারস্পরিক আসক্তি ও অর্থের আকাঙ্ক্ষাকে বুঝিয়েছেন। এর সঙ্গে নাম-যশ, প্রতিপত্তি লাভ প্রভৃতি পার্থিব চাহিদাও বুঝিয়ে যাবে।

১৮৮২-র ১৪ ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে হুঁশিয়ার করছেন ঠাকুর :''কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা চলে যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব।" গৃহস্থাশ্রমে কামিনীকাঞ্চনের মধ্যেই থাকতে হয়। তাই অধর সেনের বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রকে সংযত জীবনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাচ্ছেন—''কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না; দু-একটি ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই-ভগ্নীর মতো থাকতে হয়, আর তার সঙ্গে সর্বদা ঈশ্বরের কথা কইতে হয়। তাহলে দুজনেরই মন তাঁর দিকে যাবে আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে। পশুভাব না গেলে ঈশ্বরের আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে পশুভাব যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি অন্তর্যামী, শুনবেনই শুনবেন, যদি আন্তরিক হয়।" সেইসঙ্গে বিচার করার গুরুত্ব দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয় দর্শনেই ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বুঝিয়েছেন : ''বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু।... টাকাতেই বা কি আছে আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে? টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না—এর নাম বিচার।... বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র—এইসব আছে। এইসব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়?"

কথামৃতে যে কথা বারে বারে জোর দিয়ে বলা হয়েছে তা হল মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। নীতিবাদী, পরোপকারী নাস্তিক প্রশ্ন তুলতে পারেন, সদ্‌ভাবে জীবনযাপন করে মানুষের কল্যাণে নানাপ্রকার সেবামূলক কাজের অনুষ্ঠান করলেই তো জীবন সার্থক হয়। ঈশ্বরলাভকে মানুষমাত্রেরই জীবনের উদ্দেশ্য বলার তাৎপর্য কী? এর উত্তরে ঠাকুরের বক্তব্য হল : ''মানুষের সাধ্য কি দয়া পরোপকার করে?" এতে অহংকারই প্রশ্রয় পায়। ''সংসারী ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্ত হলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে। কর্মের ফল—লাভ, লোকসান, সুখ, দুঃখ ঈশ্বরকে সমর্পণ করে।... (শুদ্ধ ভক্ত)... নিষ্কামভাবে যদি কাউকে দান করে সে নিজের উপকারের জন্য, পরোপকারের জন্য নয়। সর্বভূতে হরি আছেন তাঁরই সেবা করা হয়! হরিসেবা হলে নিজেরই উপকার হল 'পরোপকার' নয়। এই সর্বভূতে হরির সেবা শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও হরির সেবা যদি কেউ করে আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে, তাদের কাছ থেকে উলটে কোনও উপকার চায় না, এরূপ ভাবে যদি সেবা করে, তাহলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম, অনাসক্ত কর্ম করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এর নাম কর্মযোগ। এই কর্মযোগও ঈশ্বরলাভের একটি পথ।" বস্তুতপক্ষে ঈশ্বরলাভ না করে পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার অর্থ জগতের বহু বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজের প্রকৃত পরিচয় না জেনেই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পরিসমাপ্ত করা। যেহেতু তিনিই সব হয়েছেন সুতরাং আত্মোপলব্ধির অভাবে জীব ও জগতের স্বরূপ পরিচয়ও অজানাই থেকে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরমসমন্বয়ী আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সমাজ-জীবনের সকল সমস্যার পিছনে কামিনী-কাঞ্চনে

আসক্তিজাত মানুষের মতুয়া বুদ্ধি তথা অহংকারকেই কারণরূপে নির্দেশ করেছে। মুষ্টিমেয়ের এই অহংকার ও আধিপত্যপ্রিয়তা সমষ্টিজীবনে সৃষ্টি করেছে মহা ভেদবুদ্ধি, ঘৃণা ও অবজ্ঞার বাতাবরণ। অর্থহীন এই ভেদবুদ্ধি কখনও লিঙ্গভেদপ্রসূত, কখনও আর্থিক অবস্থার তারতম্যে, কখনও মেধা ও পার্থিব বিদ্যালাভের সুযোগের ভিত্তিতে, কখনও মনুষ্যসৃষ্ট জাতিভেদের কারণে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যে সত্যযুগ এসেছে তার বিশেষত্ব স্বামীজীর ভাষায়—''এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-মূর্খ ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ, সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন।'' নিজের আচরণে তো বটেই, কথালাপেও ছড়িয়ে দিয়েছেন এইসব ভেদাভেদ দূর করে দেবার বার্তা।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে পুরুষ ও প্রকৃতি অর্থাৎ Masculine & Feminine Principles of the Universe, অভেদ : ''তাঁদের ভেদ নাই... একটি বললেই আর একটি তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি ও দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না। আর অগ্নি ছাড়া দাহিকা শক্তিকে ভাবা যায় না।'' শ্রীমা সারদা দেবীকে ''ও কি যে সে, ও আমার শক্তি' বলে নিজের সঙ্গে অভিন্নতা প্রদর্শন করেছেন, তাঁরা নিজেরাও পরস্পরকে মা কালীরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। শিবানন্দ স্বামীকে ঠাকুর বলেছেন, ''ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন আর এই নহবতের মা—অভেদ।'' মাকেও বলেছেন, ''তুমি আমার মা আনন্দময়ী।'' মাও ঠাকুরের খাবার সময় বিস্মিতনেত্রে দেখেছেন, মা কালীই অন্নগ্রহণ করছেন। ঠাকুর স্বীকৃতি দিচ্ছেন—''তুমি ঠিকই দেখেছ।'' শ্রীমায়ের মাতৃভাব ও ঠাকুরের সন্তানভাবের অনুশীলনবার্তা এযুগের নারী-পুরুষ ভেদ অপসারণের চাবিকাঠিরূপে প্রদত্ত নতুন শ্রুতিবচন।

বিত্তবান মানুষ দরিদ্রকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, সমাজের ধনী-দরিদ্র ভেদ বিশেষভাবে বজায় রাখে। এতে ধনীর অহংকার চরিতার্থ হয়ে তার আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বনাশ হয়। অবজ্ঞাত দরিদ্র হীনম্মন্যতায় ভুগে আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলে। সিঁন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মভক্তদের ঠাকুর বললেন, ''টাকার অহংকার করতে নাই। যদি বল আমি ধনী—তো ধনীর আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে।'' ঠাকুর উদাহরণ দিলেন, সন্ধ্যার পর জোনাকির অভিমান দূর হয় নক্ষত্রের আলোয়, নক্ষত্রের অভিমান দূর হয় চন্দ্রোদয়ে আবার চন্দ্রের অভিমান দূর হয় সূর্যের জ্যোতির্ময় প্রকাশে। ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তাহলে ধনের অহংকার হয় না।

চালকলাবাঁধা বিদ্যা অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের জন্য পার্থিববিদ্যায় পারদর্শিতাকে ঠাকুর চিরকালই তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। বিদ্যাসাগরকে বলছেন, ''শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া। না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মতো পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে।'' অথচ এই বিদ্যার জন্য আবার অহংকার কত? দক্ষিণেশ্বরে মণিলাল মল্লিককে এক পণ্ডিতের গল্প শোনাতে বলছেন। নৌকা করে গঙ্গা পার হবার সময় সেই পণ্ডিতটি সগর্বে নানা শাস্ত্রে নিজের বিদ্যার পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং কিছুই যে পড়েনি তাকে নেহাতই অনুকম্পার পাত্র বলে মনে করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ভয়ংকর ঝড় এসে নৌকো প্রায় ডুবিয়ে দেবার উপক্রম করল। তথাকথিত মূর্খব্যক্তিটি পণ্ডিতকে বলল—আপনি সাঁতার জানেন কি? পণ্ডিত বললেন—না। সে বললে—আমি সাংখ্য পাতঞ্জল জানি না কিন্তু সাঁতার জানি।—এই গল্পের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের শাস্ত্রবাণী : ''নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে? ভবনদী পার হতে জানাই দরকার। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।'' সে-ই যথার্থ পণ্ডিত, যার বস্তুলাভ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র, নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন মাস্টারমশাইকে ঠাকুর দ্বিতীয় দর্শনেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?'' দশজন বিদ্বানের মতোই তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ''আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।'' শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ''আর তুমি জ্ঞানী?'' মাস্টারের

অহংকারে আঘাত লাগল, কারণ তখনও পর্যন্ত তিনি জানতেন, ''লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়।'' পরে জেনেছিলেন, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে সমাজে প্রচলিত সাধারণ পণ্ডিত-মূর্খ ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ মুছে যায়।

জাতিভেদ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের বিচারও সম্পূর্ণ ঈশ্বরকেন্দ্রিক। সুরেন্দ্রের বাড়িতে তার ভ্রাতার প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলছেন, ''কেবল এক উপায়ে জাতিভেদ উঠতে পারে। সেটি ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তিতে অস্পৃশ্য জাত শুদ্ধ হয়—চণ্ডাল ভক্ত হলে আর চণ্ডাল থাকে না। চৈতন্যদেব আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন।'' সমাজমানসে বর্ণভেদ এত দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত যে শ্রীরামকৃষ্ণকেও একাধিকবার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে—ব্রাহ্মণশরীর না হলে মুক্তি হয় কি না। ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন, ''হাজরা বলে ব্রাহ্মণ শরীর না হলে মুক্তি হয় না। আমি বললাম, সে কি! ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হবে। শবরী ব্যাধের মেয়ে, রুইদাস যার খাবার সময় ঘণ্টা বাজত—এরা সব শূদ্র। এদের ভক্তিদ্বারাই মুক্তি হয়েছে। হাজরা বলে তবু!''

আবার গিরিশবাবুর বাড়িতে একজন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী প্রশ্ন করলেন—ব্রাহ্মণ না হলে কি সিদ্ধ হয়? ঠাকুর জবাব দিলেন, ''কেন শূদ্রের ভক্তির কথা আছে। শবরী, রুইদাস গুহক-চণ্ডাল—এসব আছে।'' ব্রাহ্মণ তবু বলছেন—এক জন্মে কি হয়? যুগাবতার পরম আশ্বাসবাণী শোনালেন, ''তাঁর দয়া হলে কি না হয়। হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘরে আলো আনলে কি একটু একটু করে অন্ধকার চলে যায়? একেবারে আলো হয়।''

ভক্তিকেই ঠাকুর জাতিভেদ ওঠানোর মহাস্ত্র বলে মনে করেছেন। কিন্তু হৃদয়ে ভক্তি নেই, সর্বভূতে ঈশ্বরদৃষ্টি নেই, কেবল সমাজসংস্কারের প্রেরণায় জোর করে জাতিভেদ ওঠানোর চেষ্টা ঠাকুর অনুমোদন করেননি। ভিতরে উচ্চবর্ণের সংস্কার দৃঢ়মূল অথচ বাইরে জাতিভেদ অস্বীকার করে সমাজসংস্কারের প্রয়াস নিতান্তই অর্থহীন—এতে কপটতা প্রশ্রয় পায়। এপ্রসঙ্গে ঠাকুর অশ্বিনীকুমার দত্তকে বলছেন, ''তা জানো, জাতিভেদ আপনি খসে যায়। যেমন নারিকেলগাছ, তালগাছ বড় হয়, বালতো আপনি খসে পড়ে। জাতিভেদ তেমনি খসে যায়। টেনে ছিঁড়ো না, ঐ শালাদের মত।''

কেবল জাতিভেদ নয়, ঠাকুর দেখেছেন, পাপবাদ মানুষকে একেবারে হীনম্মন্য করে তোলে। মানুষ যদি একবার নিজেকে 'পাপাত্মা', 'পাপসম্ভব' বলে বিশ্বাস করে ফেলে তাহলে তার পরিত্রাণের উপায় কী? শ্রীরামকৃষ্ণের সদর্থক শাস্ত্রে পাপবাদের কোনও ভূমিকাই নেই। কেশবচন্দ্রকে ঠাকুর বলছেন, ''খ্রীষ্টানদের একখানা বই (বাইবেল) একজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে বললাম। তাতে কেবল পাপ আর পাপ। তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে কেবল পাপ আর পাপ। যে ব্যক্তি আমি বদ্ধ বারবার বলে সে শেষে বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন আমি পাপী, আমি পাপী এই করে, সে তাই হয়ে যায়। এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই যে, তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ!''

ঈশ্বরকে আপনার বোধে বিশ্বাস করেই মানুষ সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় : ''আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কী? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে?''

কলিযুগে (বর্তমান কালে) নারদীয় ভক্তি। চাই ঈশ্বরের প্রতি 'পরানুরক্তি' অর্থাৎ পরম ভালোবাসা। ভালোবাসা এলেই তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা আসবে। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দেবেনই দেবেন। 'ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে।' ''যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য প্রকাশ হচ্ছে তার ঈশ্বরলাভের আর দেরি নাই। অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের গুণকীর্তন, সত্যকথা—এইসব।'' দক্ষিণেশ্বরে জনৈক গোস্বামীকে কলিতে নামমাহাত্ম্যের তাৎপর্য ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন : ''নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মন রয়েছে

তাতে কি হয়?" তাই ঠাকুরের উপদেশ : ''নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়, আর যে সব জিনিস দুদিনের জন্য, যেমন টাকা, মান, দেহের সুখ, তাদের উপর থেকে যাতে ভালোবাসা কমে যায়, প্রার্থনা কর।"

নবযুগের শ্রীরামকৃষ্ণ-শাস্ত্রের পরিধি বিশ্বজোড়া। তাঁর মহৎ উদার বাস্তবসম্মত প্রেমানুরঞ্জিত বাণী মানুষের জীবনসমস্যার সমাধান এবং তাদের চলার পথের দিঙ্‌নির্দেশ করে তাঁর চরণতলে সমবেত করছে। প্রাচীন যুগের শাস্ত্র প্রভুসম্মিত—তা প্রভুর মতো দীর্ঘকাল মানুষের কর্তব্য নির্দেশ করে এসেছে। এযুগে 'Love personified' শ্রীরামকৃষ্ণের শাস্ত্র পরমস্নেহে মানুষকে শ্রেয়ঃপথে চালিত করে হয়ে উঠেছে মাতৃসম্মিতা শ্রুতি।

এই আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপচারিতার যে অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্য থেকে যুগোপযোগী কয়েকটি বেদবাণীর উল্লেখ করা হল :

(১) সত্য কথা কলির তপস্যা।

(২) (সত্যস্বরূপকে লাভ করার জন্য) অনন্ত মত, অনন্ত পথ।

(৩) রুচিভেদ, অধিকারিভেদ অনুযায়ী একটিকে জোর করে ধরতে হয়।

(৪) মতুয়ার বুদ্ধি ভালো নয়।

(৫) যে সমন্বয় করেছে, সে-ই লোক।

(৬) যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা, (কাজেই যতক্ষণ আমিবোধ ততক্ষণ) লীলাও সত্য।

(৭) ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন কিন্তু মানুষে বেশি প্রকাশ।

(৮) ঈশ্বর মানুষ হয়ে অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন, মানুষকে প্রেমভক্তি শেখাবার জন্য।

(৯) জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

(১০) আমি ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস—এই পাকা আমি নিয়ে থাকতে হয়।

(১১) কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ (সংসারীর পক্ষে সংযত ব্যবহার)।

(১২) নিষ্কামকর্মে নিজের কল্যাণ। এর নাম কর্মযোগ। এও ঈশ্বরলাভের একটি পথ।

(১৩) ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

(১৪) ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, না জানার নাম অজ্ঞান।

(১৫) জাতিভেদ এক উপায়ে উঠে যেতে পারে—ভক্তি।

(১৬) কলিযুগে (বর্তমান কালে) নারদীয় ভক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রবল অনুরাগ।

(১৭) ঈশ্বরে অনুরাগের ঐশ্বর্য—বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের গুণকীর্তন ও সত্যকথা।

(১৮) নামমাহাত্ম্য আছে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার।

(১৯) নাম করো আর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করো, যাতে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়, আর যে সব জিনিস দুদিনের জন্য তাদের ওপর যাতে ভালোবাসা কমে যায়।

শ্রীম-র বিনম্র লেখনীতে এযুগের নব বেদবাণী যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার সামান্য অংশ এখানে উল্লিখিত হল। এর দু-একটি বাণীও জীবনে রূপায়িত করলে সত্যযুগের মহিমার উপলব্ধি ত্বরান্বিত হবে।

সংগ্রহ

শ্রীমুখে স্বীকৃতি

''শ্রীম—একদিন ঠাকুর হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, 'এই মুখ দিয়ে ভগবান কথা কন, সেইজন্য অবতার। তা থেকেই বেদ বেরিয়েছে। এইখানেই (অর্থাৎ ঠাকুরের কাছে) আনাগোনা করলেই হবে।' "

(স্বামী জগন্নাথানন্দ, *শ্রীম-কথা*, মিত্র ও ঘোষ : কলকাতা, ১৩৪৮, পৃঃ ৩৪৭)